জাতীয় চার নেতা

মোস্তাক আহ্‌মাদ

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

জাতীয় চার নেতার অনুগামী ও অনুসারী
ভক্ত পাঠকদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর একান্ত সহযোগী জাতীয় চার নেতার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সহযোগী ও রাজনৈতিক সহচর হিসেবে জাতীয় চার নেতা তাঁর পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন।

জাতীয় চার নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল সংগঠক ছিলেন। তেমনিভাবে তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। অপরদিকে ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এই মহান চার দিকপাল বাংলাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর সহচর হিসেবে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা ও মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে মওলানা ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখদের পাশাপাশি জাতীয় নেতারা শুরু থেকে সোচ্চার থেকে বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই মহত্তম রাজনৈতিক অর্জন এবং এর রূপকার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে জাতীয় চার নেতার অবদান জাতি আজীবন মনে রাখবেন।

যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে ততদিন বাঙালি জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঅম্লান থাকবেন এবং জাতীয় চার নেতাও বাঙালির হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মোস্তাক আহ্‌মাদ

সূচি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ● ১১
তাজউদ্দিন আহমদ ● ৭০
(ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী ● ৯৭
এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ● ১১০
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ● ১১২

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল সংগঠক, জননেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ থানার (তখনকার মহকুমা ও বর্তমান জেলা) যশোদল ইউনিয়নের বীরদামপাড়া গ্রামের বিখ্যাত 'সাহেববাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা যথাক্রমে সৈয়দ আবদুর রইস এবং নুরুন্নেসা খাতুন রূপা। তিনি পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর একমাত্র বড় বোন আনোয়ারা খাতুন এবং তাঁর একমাত্র ভাই সৈয়দ ওয়াহিদুল ইসলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের জন্মের পর আদর করে তাঁর নাম রাখা হয় 'গোলাপ'। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু গ্রামের পাঠশালায়। এখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায়ও বৃত্তি লাভ করেন। পরে তাঁকে নিজ বাড়ি হতে ৩ মাইল দূরে মহকুমা শহরের আজিম উদ্দিন হাই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হয়ে হয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পড়াশশুনা করেন। জুনিয়র বৃত্তি পীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর মেধাবী ছাত্র নজরুলকে তাঁর পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহে নিয়ে জেলা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। তিনি সেখানে নবম ও দশম শ্রেণিতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৪১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে কৃতিত্বের সাথে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন এবং ঐ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৬ সালে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯৪৮ সালে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি আইনশাস্ত্রে প্রথম পর্ব শেষ করেন।

তারপর তিনি যোগ দেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসাবে। পরের বছর ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ

হন। তাঁকে আয়কর বিভাগে পোস্টিং দেয়া হয়। কিন্তু মাত্র নয় মাস চাকরি করার পর এ স্বাধীনচেতা সিএসপি অফিসার ঐ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় কলেজের শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেন।

কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫৩ সালে তিনি এল এল বি শেষ পর্ব পাস করেন এবং ময়মনসিংহ জেলা বারে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালে তিনি কটিয়াদী থানার বোয়ালিয়া গ্রামের নুরুজ্জামান সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা নফিসা খাতুরে সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে। এদের মাঝে প্রথম ছেলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থান করে ১৯৯৬ সনে দেশে ফেরেন এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি প্রথম ১৯৯৬ সালে কিশোরগঞ্জ সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ নির্বাচিত হন এবং পরপর কয়েকবার সাংসদসহ মন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় ছেলে সৈয়দ মনজরুল ইসলাম লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তৃতীয় ছেলে সৈয়দ সাফায়াতুল ইসলাম প্রথমে সোবাহিনীতে ব্রিগেডিার হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ ছেলে সৈয়দ শরিফুল ইসলামও লন্ডনে অবস্থান করছেন। মেয়েদের মধ্যে বড় মেয়ে লিপি একজন ডাক্তার। তিনি এখন তাঁর স্বামীর সাথে লন্ডনে অবস্থান করছেন। ছোট মেয়ে রূপা বিবিএ পাস করে স্বামীসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিং জেলা বারের একজন প্রতিষ্ঠিত ও নামকরা আইনজীবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও কর্মজীবনে দীর্ঘদিন রাজনীতির সংস্পর্শে ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি পর পর দুবার এসএম হলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সেশনে)।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যখন সূত্রপাত, তখন সৈয়দ নজরুল ছিলেন এর সম্মুখ সারিতে। জিন্নাহ সাহেব যখন কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন, তখন যে ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা তার বিরুদ্ধে না না বলে গর্জে ওঠেন সৈয়দ নজরুলও ছিলেন তাদের একজন। এসএম হলের ভিপি হবার সুবাদে তাঁর সাথে জানাশোনা ছিলো সদ্য কোলকাতা থেকে আগত ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে।

কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর তিনি ছিলেন রাজনীতির বাইরে। তবে শেখ মুজিব চেষ্টা করেছেন তাঁকে আয়ামী লীগে টানার। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও সৈয়দ নজরুলকে লীগে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ঐ বছরই ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর আওয়ামী লীগ তথা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাত্র ১ বছরের মাথায় দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। পরে পুনরায় রাজনীতি চালু হলে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে যান।

তিনি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও পরে ১৯৬৪ সালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সে বছর শেখ মুজিব ও তাজিউদ্দিন আহমদ যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ষাটের দশকে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বার বার মিথ্যা মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছেন এবং সব শেষ ১৯৬৮ সালে মিথ্যা ও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। ওই সংকটময় মুহূর্তে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের হাল ধরেন এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দক্ষতার সাথে সংগঠনকে পরিচালনা করেন।

৬ দফা আন্দোলন ও ঐতিহাসিক '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় তাঁর ভূমিকা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। '৬৯-এর পর দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। ঐ নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন আর উপনেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

পরের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। পাক সামরিক চক্র ও ভুট্টোর দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলো। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নাম করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে সৈন্য প্রেরণ করলো।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাউসে বঙ্গবন্ধুর সাথে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনা শুরু করলেন একাত্তরের মার্চ মাসে। ঐ আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর তিন সহযোগী প্রধান ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অন্য দু'জন ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন।

শেষ পর্যন্ত আলোচনা ভেঙে যায়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান করাচী চলে যান এবং পূর্ব বাংলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দিয়ে যান। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারাদেশে পাকবাহিনী নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চ জিরো আওয়ারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই তিনি পাকিস্তানী কমান্ডো বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। ২৫ মার্চই বঙ্গবন্ধু সম্যক অবস্থা বুঝতে পারেন এবং সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীনসহ সব নেতাকে নিরাপদ অবস্থানে সরে যাবার নির্দেশ দেন।

২৫ মার্চের পর সব শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ভারতের বুকে আশ্রয় নেন। তাছাড়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারে লাখ লাখ বাঙালি প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়।

শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। মুক্তির সংগ্রাম। প্রবাসে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। ১০ এপ্রিল গঠিত হলো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকার। দেশের রাষ্ট্রপতি করা হলো বঙ্গবন্ধুকে। আর উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তিনি হলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন তাজউদ্দিন আহমদ। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন বিপ্লবী সরকারের সদস্যরা।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। যার অন্যতম নেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানে সফল ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রদান করেছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই দুই বলিষ্ঠ নেতার ভূমিকা বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো মরণজয়ী লড়াইয়ের পর। আর ১৯৭২ সলের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন। এর দু'দিন পর ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন এবং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আর সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্পমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন। ১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি হতে ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

এরপর দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হলো। বঙ্গবন্ধু হলেন রাষ্ট্রপতি। আবার উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এর আগে ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল

মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংগঠিত হয়। ১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪. মন্ত্রিসভা সচিবালয় ৫. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ৬. স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ১০. সংসদ বিষয়ক বিভাগ ১১. কৃষি বিভাগ ১২. প্রকৌশল বিভাগ।

মন্ত্রণালয় বহির্ভূত সংস্থা

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা ছিল, যারা সরাসরি মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করত, যেমন : ১. পরিকল্পনা কমিশন ২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড ৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি ৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড।

অঙ্গসংগঠন

মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হিসেবে নিম্নলিখিত বেসরকারি সংস্থা, দল, গোষ্ঠী, সমিতি, বাহিনী ইত্যাদি ভূমিকা পালন করেছে।

১. যুব নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ও প্রশিক্ষণ বোর্ড ২. বাংলাদেশ হাসপাতাল ৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৪. জয় বাংলা পত্রিকা (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র) ৫. বাংলাদেশ বুলেটিন ৬. বহির্বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংগঠন ৭. বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ৮. স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ৯. বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী ১০. বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী ১১. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি ১২. বাংলাদেশ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী পরিষদ ১৩. নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লীগ ১৪. বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি, লন্ডন ১৫. লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টসিয়া।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে এর প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। এই কেন্দ্র থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। এই কেন্দ্রের সিগনেচার টিউন ছিল 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে। এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠে...' গানটি বাঙালির উদ্দীপনায় আলোড়ন তুলেছিল।

কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমানবাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। ফলে এটি অচল হয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দ্বিতীয় পর্ব

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র অচল হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে দশজনের একটি সম্প্রচার দল নিয়ে এই বেতার কেন্দ্র শালবাগান ও বাগাফা হয়ে বেলুনিয়া ফরেস্ট হিলস রোডে স্থানান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তা

নতুন পর্যায়ের বেতার কেন্দ্রটির সংগঠনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন রেডিও পাকিস্তানের স্ক্রিপ্ট লেখক ও গায়ক বেলার মোহাম্মদ। তাঁর অন্য সহযোগীরা হলেন, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, আবুল কাশেম সন্দীপ, কাজী হাবিবউদ্দিন আহমেদ মনি, আমিনুর রহমান, রশিদুল হোসাইন, এ.এম. শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস শাকের ও মুস্তফা মনোয়ার প্রমুখ।

সম্প্রচারকাল

কালুরঘাট থেকে নেওয়া ট্রান্সমিটারটিতে কোনো যান্ত্রিক গাইড বই ছিল না। দলের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার সদস্য আবদুস শাকের এটিকে কার্যক্ষম করে তোলেন। এই পর্বের দৈনন্দিন কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হতো।

কলকাতায় স্থানান্তর

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। একই দিনে সেখানে এটি তার কার্যক্রম শুরু করে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের তৃতীয় কার্যক্রম

ঢাকা থেকে আসা রেডিও-র পুরাতন স্টাফ ও নবাগতদের নিয়ে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মে থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রূপে এর তৃতীয় কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেন্দ্রটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগপত্র ইস্যু শুরু করে, তবে কর্মকর্তাদের নিয়োগ মূলত ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস থেকে কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হয়।

তাজউদ্দিন আহমদ

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মাতার নাম মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন।

তাজউদ্দিন আহমদের পিতা মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান ছিলেন আরবী, ফারসী, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভূমিজ মধ্য শ্রেণির সদস্য। ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা ছিল তাঁদের পারিবারিক রীতি। তাঁদের বাড়িতেই ছিল ধর্ম শিক্ষার জন্য মক্তব।

তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৫৯ সালের ২৬ এপ্রিল সৈয়দা জোহরা খাতুন লিলির সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা ৪ সন্তানের জনক-জননী। সন্তানদের মধ্যে তিন কন্যার নাম শারমিন আহমদ লিপি, সিমিন হোসেন রিমি, মাহজাবিন মিমি ও পুত্র তানজিম আহমদ সোহেল। তানজিম আহমদ ওরফে সোহেল তাজ দীর্ঘ সময় প্রবাসে ছিলেন। তিনি প্রবাস থেকে ফিরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দনে এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি স্বরাষ্ট্র প্রতি মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন।

তাজউদ্দিন আহমদের সহধর্মীণী সৈয়দা জোহরা খাতুন লিলি ওরফে বেগম জোহরা তাজউদ্দিন বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেল হত্যার পর সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীত করা হয়। তাঁকে আওয়ামী লীগের আহ্বায়িকা করে ১৯৭৬ সালে দলীয় তৎপরতা শুরু হয়। সেই থেকেই তিনি জীবনের উপর ঝুঁকি এবং বহু দুঃখ কষ্ট করে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেন। আজকের বর্তমানে আওয়ামী লীগের যে অবস্থা তা অনেকটা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিনের অবদান। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মেজর জিয়ার সামরিক শাসন এবং এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রামে এবং ১৯৯০ এর গণঅভ্যথানে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অগ্রণী ভূমিকা

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

আইন ও শৃখলা রক্ষা

ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহাকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন।

ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহাকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

জেলের দপ্তরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

আনসার বাহিনী তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবল সেইসব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষদের নির্যাতনের জন্য সৈন্য সমরাস্ত্র আনা নেয়ার কাজে কোনরকম সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহ বিশেষকরে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য খাদ্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু খালাস তরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন।

আমদানি

আমদানিকৃত সকল মালামাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং

কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতে কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের সেইসব অফিসই খোলা থাকবে যেগুলি রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর কাজে কোনরূপ সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

সড়ক পরিবহন

সারা দেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

ডাক যোগাযোগ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, মনিঅর্ডার ইত্যাদি পৌছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়া-দেয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু বিকেল ৩ট থেকে ৪টা এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

নদী বন্দর

অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ই পি এস সি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও আইডব্লিউটিএ'র প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপাওে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

প্রচার মাধ্যম

বেতার টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

হাসপাতাল ক্লিনিক

দেশের সকল হাসপাতাল টিবি ক্লিনিক কলেরা রিচার্স ইনস্টিটিউটসহ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টার প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবেন।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস

বিদ্যুৎ গ্যাস সরবরাহ চলবে। এবং এর সাথে সাথে এই কাজের মেরামত ও সংরক্ষন কাজের সাথে জড়িত ইপি ওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ সচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী এসেন্সি বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাকটরদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ

বৈদেশিক সাহয্যে তৈরি রাস্তাঘাট পুল প্রকল্পসহ সকল প্রকার সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি পরিশোধ কর দেয়া হবে।

বেতন দান

সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন- যাদের রোজ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে, তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা তা দিতে হবে। বেতন বিল তৈরি করার জন্য সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যাংক, বীমা ও ট্রেজারী

ব্যাংক, বীমা ও ট্রেজারী পরিচালনার জন্য সকার ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রয়োজনে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। কিন্তু শুক্রবার ও শনিবার ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে অনুমোদিত কাজের লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক

এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান

যে কজন নেতার রাজনৈতিক মেধা, প্রজ্ঞা ও শ্রম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তাঁদের মধ্যে আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান অন্যতম। তিনি সকলের কাছে এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান নামে সমধিক পরিচিত।

আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের জন্ম ১৯২৬ সালে রাজশাহী শহরে। তাঁর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্থান ছিল কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে অর্থনীতিতে অনার্স সহ এমএ পাস করেন। পরে ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাস করেন।

ছাত্রজীবনেই এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি পদে।

১৯৫৬ সালে তিনি যোগ দেন আইন ব্যবসায়। ওই বছরই নির্বাচিত হন রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পর এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান যোগ দেন আওয়ামী লীগে। ১৯৫৭ সালে তিনি রাজশাহী আওয়ামী লীগের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এক নাগাড়ে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে প্রথমবার এবং ১৯৬৫-এর মার্চ মাসে দ্বিতীবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে রাজশাহী থেকে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৬৫-এর মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে রাজশাহী থেকে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৬৭ সালে এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়কের দায়িত্ব নেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় আইয়ুব খানের সরকার বাংলার জনগণের ওপর যে নির্যাতন চালায় তার বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাংলায় ছাত্র-সংগ্রাম ১১ দফা দাবি নিয়ে এক আন্দোলন শুরু করে। এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদের এই দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আইয়ুব খান যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন সেই গোলটেবিলে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলে সদস্য হিসাবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজশাহী থেকে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনী বাঙালিদের ওপর হামলা চালালে তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান। এর আগে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ঢাকার আওয়ামী লীগের যে হাই-কমান্ড গঠিত হয় তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়া হাই-কমান্ডে অন্য তিনজন সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন আহমদ ও মনসুর আলী। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলে এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১-এর ২৩ ডিসেম্বর তাঁকে দেয়া হয় স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এই বছর ২০ জানুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বছর মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হলে তিনি শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর একটি বিদ্রোহী দলের হাতে নিহত হলে অনেকের সঙ্গে তাঁকেও কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বছরই ৩ নভেম্বর কারাগারের রীতিনীতি উপেক্ষা করে সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির গুলিতে অপর তিন নেতার সঙ্গে তিনিও নিহত হন।

এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী স্তরে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।